পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী

নন্দিনী হোসেন

ধর্মের স্রষ্টা পুরুষ। তাই দেখি 'ঈশ্বর' ভাবনাতেও পুরুষালী ছায়া। পুরুষের জন্য সব আরাম-আয়েশ স্ত্রী, দাসী, বাদী কতো কী। নারীর জন্য কিছুই নেই। জীবনে-মরণে একই পুরুষ । মরেও তার শান্তি নেই- বেহেস্তে গেলেও যেতে হবে, হাড়মাংস জ্বালানো সেই মিনষেটার সাথে! কিন্তু বেহেস্তে যাবেন কিভাবে? পবিত্র আল কোরানে ইসলামের জন্য জিহাদ (সংগ্রাম) করলে, মহান আল্লাহতায়ালা জান্নাতে (স্বর্গ) প্রবেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন (সুরা ইমরান, ৩:১৪২; সুরা মোহাম্মদ, ৪৭:৪-৬; সুরা ফাতাহ, ৪৮:৫); তা জান্নাতে গিয়ে জীবনবাজি রেখে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা জিহাদিরা কী পাবেন? পাবেন-যতখুশি ফলমূল, সুরা ভর্তি পেয়ালা আর মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধানরত আনতনয়না-পরমাসুন্দরী চিরকুমারীদের (সুরা সোয়াদ, ৩৮:৫১-৫২; সুরা আদ দোখান, ৪৪:৫১-৫৭); যারা চিরকুমারী, প্রেমময়, যেন এক একটি ঢেকে রাখা মুক্তা (সুরা আল ওয়াক্বেয়া, ৫৬:১০-৪০); যাদের এর আগে কোন মানুষ বা জিন কখনো স্পর্শ করে নি (সুরা আর রহমান, ৫৫:৫৬); এ হুরেরদল (জার্মান ভাষায় 'হুর' শব্দের অর্থ গণিকা!) জান্নাতের তাঁবুতে রয়েছে অপেক্ষমাণ অবস্থায় (সুরা আর রহমান, ৫৫:৭২)। কিন্তু এগুলো তো পুরুষদের জন্য, আর নারীর জন্য? কিছুই নয়। কেউ কেউ বলেন নারীর জন্য রয়েছে তার "পূন্যবান স্বামী"! ভালো করে বিভিন্ন ধর্মের কেতাব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জান্নাত বা স্বর্গ হচ্ছে এক একটি গণিকালয়, যেখানে মদ-নারীর ছড়াছড়ি। আর এই গণিকালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা! দুঃখের কথা, এরপরও আমাদের এ সমাজের বেশিরভাগ নারীই এই ধরণের ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং বিপদের দিনে তাঁর কাছেই আশ্রয় খোঁজেন!

সোজা কথায় নারীর স্বার্থ কখনও পুরুষের ধর্ম দেখেনি; দেখার কথাও নয়। তাই প্রচলিত সবগুলো ধর্মগ্রন্থ আতিপাতি করে খুঁজেও পুরুষতান্ত্রিকতার বাইরে দাঁড়িয়ে লেখা হয়েছে এমন একটা শব্দও পাওয়া যাবে না। আসলে পুরুষের চোখ নারীকে যেভাবে দেখে, দেখতে ভালোবাসে, যেমন করে নারীকে পেতে চায় ধর্মগ্রন্থগুলোকে ঠিক সেভাবেই সাজানো হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হওয়া স্বাভাবিক আল্লাহ/ঈশ্বর/গড ভয়ানক এক চোখা! ভয়ানক রকম পুরুষতান্ত্রিক নারীলোভী; আবার আর সেই পরিমাণ-ই নারী বিদ্বেষী! নিচের হাদিস দেখলে নারীর অবস্থান ধর্মের মগজে কোথায় কিছুটা ধারণা করা যায়:

> হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত : নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দান করতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।'' (তিরমিযী)

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার ইমাম গাজ্জালি (রঃ) বিখ্যাত 'ইয়াহ্ইয়া উলুমেদ্দিন' (পৃ-২৩৫)গ্রন্থে লিখেছেন -

> "স্ত্রীর উচিৎ স্বামীকে তার নিজ সত্ত্বার চেয়েও উপরে স্থান দেয়া, এমনকি তার সকল আত্মীয়স্বজনের উপরে স্থান দেয়া। সে স্বামীর জন্যে নিজকে সদা-সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবে যেন স্বামী যখন ইচ্ছা তাকে ভোগ করতে পারে.. ।"

যেহেতু ধর্ম এনেছিল পুরুষ তাদের স্বার্থে - পুরুষের ধর্মে নারীর স্থান, তাই তাদেরই পদতলে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী। নারী তার প্রয়োজন মেটাবে, খুব বেশি হলে সহচরী সেজে সময়ে সময়ে মিষ্টি দুটো কথা শুনে বর্তে যাবে - এই তো নারী। খ্রিস্টান ধর্মে আছে : এ্যাডাম-এর প্রয়োজন হয়েছিল বলেই ইভের সৃষ্টি। ক্রিস্টিয়ান লেখক-শিল্পীরাও তাদের কর্মে প্রচার করতে ভালোবাসেন, 'Women are subordinate to men because they are created after men and from men and for men. (Drury, 1994, 34)'

তাছাড়া সেন্ট পলের দু-একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে; বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা যায়: "...I permit no women to teach or to have authority over a man; she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the women was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through childbearing, provided they continue in faith and love and holiness with modesty." (1 Timothy 2:8-15)

সেন্ট পলের আরেকটি উদ্ধৃতি, "Indeed, man was not made from women, but women from man. Neither was man created for the sake of woman, but women for the sake of man." (1 Corinthians 11:3-10)

কি চমৎকার! তাহলে তো আর কোন কথাই থাকে না। ধর্মীয় মগজ থেকে উৎসারিত এই রকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে। এখানে ইসলাম ধর্মের আরও কিছু নারী সম্পর্কীত হাদিস নিচে উল্লেখ করা হল :

> হযরত মোহাম্মদ বলেন 'আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষের জন্য মেয়েদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিতনা ও বিপর্যয় রেখে যাইনি।'' (বোখারি ও মুসলিম)

> 'নারী (জাতির মূল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম নারী, আদি মাতা হাওয়া) পাঁজরের (উর্দ্ধতম হাড় হইতে সৃষ্ট। পাঁজরের হাড় সমূহের মধ্যে উর্দ্ধতম হাড় খানাই সর্ব্বয়াধিক বাঁকা। তুমি যদি উহাকে পূর্ণ সোজা করিতে তৎপর হও যে, তুমি তোমার মন মত পূর্ণ সোজা না করিয়া ছাড়িবে না) তবে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর যদি উহাকে তোমার মন মত পূর্ণ সোজা করায় তৎপর হও, তবে অবশ্য উহার মধ্যে একটু বক্রতা থাকিবে,কিন্তু ভাঙ্গিবে না, আস্ত থাকিবে, তুমি উহার দ্বারা সাহায্য, সহায়তা লাভ করিয়া নিজের অনেক কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।'' (বোখারি শরিফ, ২০৫)

> ‘স্বামী তাহার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আসিবার জন্য ডাকিলে যদি স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় (এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়) তবে ভোর পর্য্যন্ত সারা রাত্র ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি লানৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন।’’ (বোখারি ও মুসলিম)

আরেকটি হাদিস এরকম,

> ‘....নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন দোযখ পরিদর্শন-কালে আমি দোযখের দ্বারে দাঁড়াইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, দোযখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে।’ (বোখারি শরিফ, ২১১)

আমরা জানি, নারীদের নির্দিষ্ট বয়সে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ বেরিয়ে ফ্যালোপিয়ন টিউবে এসে শুক্রকীটের জন্য অপেক্ষা করে, শুক্রকীট না পেলে ওই ডিম্বকোষের মৃত্যু ঘটে এবং ঋতুস্রাব হিসেব বেরিয়ে আসে। এই ঋতুস্রাবের মেয়াদ প্রত্যেক নারীরই নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে চার-পাঁচ দিন স্থায়ী হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে - এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যাপার, শুচি-অশূচির কোনো ব্যাপার নয়। তবে এই সময় নারীদের প্রয়োজন একটু বিশ্রামের । অথচ আল কোরানের দৃষ্টিতে রজঃস্বলা নারী অশূচি-দূষিত, তাই এ সময় স্ত্রীসঙ্গ বর্জনীয় (সূরা বাকারা, ২:২২২)। কিন্তু হাদিস থেকে জানা যায়, ‘রজস্বঃলা স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষ সংগত হলে তাকে এই কাজের জন্যে এক দিরহাম সদকা দিতে হবে। রক্তের রং কিছুটা হলদেটে হলে সদকার পরিমাণ হবে অর্ধ দিনার আর সম্পূর্ণ লাল হলে এক দিনার (মিশকাত : ৫৫৩, ৫৫৪)।’’- তাহলে দেখা যায়, কোরান যা বাতিল করেছে, হাদিস তা সামান্য সদকার বিনিময়ে হালাল করে দিয়েছে!

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক নারী আসলে ধর্মের দৃষ্টিতে মনুষ্য পদবাচ্যই নয়! তাকে কিভাবে কোন কৌশল অবলম্বন করে দমিয়ে রাখা যাবে এবং তার থেকে নিজ স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে তার-ই যেন সব ফন্দি-ফিকির বের করা হয়েছে। ‘পবিত্র ধর্মে’র নামে নারীকে পুরুষতান্ত্রিকতার যাঁতাকলে পেষণ করা সহজ। যুগ যুগ ধরে এই ধুরন্ধর কৌশলেই নারীর ‘বাঁকা চলন’কে বশে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীও খুশী। ধর্ম বলে কথা। ‘পবিত্র’ জ্ঞানে পিপড়ের সারির মত পিলপিল করে ধর্মের পিছনে ছুটছে তো ছুটছেই। এছাড়া নারীর শিক্ষা-দীক্ষাও নারীর নিজস্ব নয়; পুরুষের-ই মনোনীত তথাকথিত শিক্ষা নিয়ে তার বড়জোর চাকুরি জুটে। তাতে হৃদয়ের অর্গল খুললেও মগজের ভিতরে পাকানো জট আর খুলে না। নারীর ভিতর শতাব্দীর অন্ধকার দূর হওয়ার গতি, তাই বড় ধীর। যার জন্য আজও দেখি ধর্মের নামে নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়ার রমরমা ব্যবসা চলে। নারী কি চাইবে, না-চাইবে, কিভাবে চাইবে, হাসবে, কাঁদবে, কিভাবে মরবে সব-ই বলে দেয় পুরুষ। হয়ত তাই দাবি দাওয়ার ছিটে ফোঁটা পেলেও বর্তে যায় নারী!

এবার একটা কেস স্টাডি দেখা যাক। তাতে আধুনিক নারীর প্রাত্যহিক জীবন যাপনের একটা খন্ডচিত্র পাওয়া যাবে। ফলে আমাদের ধারণা পেতে সুবিধা হবেণদুই হাজার আট সালের একজন মুসলিম বঙ্গনারীর

জীবনে মধ্যযুগের আরবে রচিত ‘ধর্ম গ্রন্থের’ আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা। নীলা (ছদ্মনাম) একজন প্রবাসী কর্মজীবী নারী। নিজ কথনেই শুনা যাক তার জীবন যাপনের প্রাত্যহিক চালচিত্র :

‘আমাকে সকাল সাতটায় কাজে দৌড়াতে হয়; তাই নাস্তাটুকুও সারার উপায় থাকে না বাসায়। ছেলেমেয়ে তখনও ঘুমিয়ে। ওদের স্কুল কিছুটা দেরিতে। নয়টার দিকে। বিকেল পাঁচটায় যখন কাজ শেষ হয়, তখন শরীর মন অনেকটা বিধস্ত। ফেরার পথে প্রায় দিনই টুকটাক বাজার সারতে হয়। তবে আজকাল বাজার-সদাই প্রায় সবই অনলাইনে করি, সময় বাঁচানোর জন্য। বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায়দিনই বিকেল ছয়টা। সন্তানদের সামন্য খোঁজ খবর নিয়েই দৌড়াতে হয় কিচেনে। নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে পাত্তা দেওয়ার অবসরটুকুও মেলে না। বিকেলের চা, রাতের খাবার, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েদের হোমওয়ার্কের খোজখবর করা এর মধ্যেই আবার টুকটাক জরুরি ফোনগুলোও সেরে নিতে হয়। তারপর ঘরদোর গুছানোর পালা শেষ করে রাতের খাবার সেরে, শুরু করতে হয় পর দিনের প্রয়োজনীয় কাজ গুছিয়ে রাখার পালা। এতসব করতে করতে রাত এগারটা সারে এগারটা বেজে যায়। এরপর কিছুটা সময় নিজেকে দেই। যেমন কিছু পড়াশুনা করার চেষ্টা করি। বই আমার প্রাণ, চেষ্টা করি প্রতি রাতে অন্তত দুই পাতা হলেও পড়ার; তারপর বিভিন্ন নিউজ সাইটগুলো ঘেটে খবরাখবর গুলো জেনে নেই। ই-মেইল পড়ি, দরকার হলে দু’একটার উত্তর দেই। এ সব শেষ করে ঘুমাতে ঘুমাতে রাত দুইটা-আড়াইটা বেজে যায়। জন্মসূত্রে আমি যেহেতু একজন মুসলিম নারী, আজ দুই হাজার আট সালে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয় পরিপূর্ণ ইসলামিক রীতিনীতিগুলো মেনে জীবন যাপন করা। আমাকে যেভাবে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে হয় সাত সকালে, সারাদিন প্রায় দৌড়ের উপর থাকতে হয়ণসেখানে আমার পায়ের আঘাতে ‘মাটি কাঁপল’ কি-না তা দেখার সময় কোথায় আমার? ঘরের ভিতর নীরবে চলাফেরা করার-ই বা সুযোগ কোথায়? আর বেহেস্তে যাওয়ার জন্য স্বামীর সন্তুষ্টি আদায়ের নানা তরিকা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মত এত অলস সময়ও আমার হাতে নেই। দুজন মানুষ একসাথে থাকতে গেলে ঠুকাঠুকি কিছুটা লেগেই থাকবে। আমার জীবনযাপনের সাথে তাই মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোহীন, অন্ধকার গৃহকোণে পরে থাকা নারীর জীবনযাপনকে মিলাতে চাইলে কি সেটা বাস্তব-সম্মত হবে? তাছাড়া আমি মনে করি ভালো-মন্দের পার্থক্যটা ঠিক কোথায় তার শতভাগ পরিস্কার কোন সীমারেখা টানা না গেলেও আমার বিবেক, বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনুযায়ী আমি নিজেকে চালিত করি। নীতিবোধ শেখার জন্য মধ্যযোগীয় ধর্মের কোন প্রয়োজন দেখি না। কারণ সেসময়কার নৈতিকতাবোধ আর আজকের নৈতিকতাবোধ এক নয়। মধ্যযুগে সামান্য চুরি করার জন্য হাত কেটে ফেলা হত। আজকের সভ্য দুনিয়ায় তা (অসভ্যদের কথা বাদ) কল্পনাই করা যায় না।’

উপরে উল্লেখিত চিত্র শুধু এই একজন নীলার নয়, বরং প্রায় প্রতিটি ঘরে একই চিত্র। কী দেশে, কী প্রবাসে। তবে পার্থক্য এই, নীলা জানেন তিনি কি করছেন, তার অবস্থান পরিস্কার। অন্যেরা দুই নৌকায় চড়তে গিয়ে খাবি খাচ্ছেন। এবার চোখ ফেরানো যাক 'ঐশী' গ্রন্থ কোরানের দিকে। একটু খোঁজ নিয়ে দেখি সেখানে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে কি বলা আছে। বিষয়টা সবচেয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে সূরাটির মাধ্যমে, তা হচ্ছে সুরা নিসা, ৩৪ নম্বর আয়াত।

> (সুরা নিসা : ৩৪) পুরুষেরা নারীদের উপর কতৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে ও তারা হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং **প্রহার কর।** যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।

এখানে আল কোরান নারী-পুরুষের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখিয়ে স্ত্রীকে অধিকার বা অনুমতি দেয়নি অবাধ্য স্বামীকে প্রহার করার, স্বামীরত্নটি যত অকালকুষ্মান্ডই হোক না কেন। নারীদের প্রহার করার বৈধতা দেওয়া আছে বহু সহি হাদিসেও[*]। এই সমস্ত হাদিসের অনেকগুলোতেই বিধৃত হয়েছে কিভাবে আমাদের মহানবী আয়শাকে বুকে আঘাত করতেন, কিভাবে আবু জাহাম তার বউকে পেটাতেন, কিভাবে আবু বকর আয়শার গর্দানে আঘাত করতেন ইত্যাদি। সাধারণভাবে কিভাবে স্ত্রীকে প্রহার করতে হবে তা বর্ণিত হয়েছে তিরমিযীতে (পৃঃ ৪৩৯)-

> 'যদি স্ত্রীর আচরণ অসৎ এবং ভক্তিহীন হয়, তবে স্বামীর অধিকার আছে স্ত্রীকে প্রহার করার; কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন শরীরের কোন হাড় ভেঙ্গে না যায়। স্বামীর অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে কখনোই স্ত্রী বাসায় ঢুকতে দেবে না। স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুকে স্ত্রী গুরুত্ব দেবে।'

নারীদের প্রহার করার ব্যাপারে এসব ইসলামী কিতাবের সাথে মিল পাওয়া যায় সনাতন হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বৃহদারণ্যকোপনিষদ (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪) এবং শতপথ ব্রাহ্মণের (৪/৪/২/১৩)[†]।

---

[*] দেখুন, হাদিস নং vol. 7, # 715; vol. 8, #828; vol. 7, #132 Bukhari, Muhammad, "Sahih Bukhari", Kitab Bhavan, New Delhi, India, 1987, translated by M. Khan, Muslim, Abu'l-Husain, Sahih Muslim, Book 009, # 3512, #2127, #3506:; "Sahih Muslim", International Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia, 1971, translated by A. Siddiqi
Dawud, Chapter 709, #2141, #2142; Abu Dawud, Suliman, "Sunan", al-Madina, New Delhi, 1985, translated by A. Hasan

[†] "বজ্র বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪/৪/২/১৩ নং শ্লোক)

কোরানের একই সুরার অন্যান্য আয়াতে যা পাই তা হচ্ছে :- (সুরা নিসা, ৪:৩) 'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হয়ার অধিকার সম্ভাবনা ।'মানে পুরুষেরা (যদি সকলের সাথে সমান ইনসাফ করতে পারে) সর্বোচ্চ চারজন নারীকে একসাথে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু নারী-পুরুষের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখিয়ে কোরানে কোথাও নারীদের একসাথে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয় নাই (বর্তমানে প্রচারিত কোনো ধর্মেই এরকম নির্দেশ বা অনুমতি পাওয়া যায় না, কেন? মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নেই বলে?); এছাড়া আল্লাহর বান্দারা যে তাদের স্ত্রীদের প্রতি এই 'সমান ইনসাফ' করতে পারবে না, সেটি মহান আল্লাহতায়ালা মনে হয় আগেই জানতেন; তাই পরবর্তীতে এ বাধা তুলে দিয়েছেন (সূরা নিসা, ৪:১২৯)। তাহলে আর থাকলো কী? পুরুষেরা বিয়ে একসাথে চারটি স্ত্রী রাখতে পারবে, তবে উপপত্নী, দাসী সম্ভোগের সংখ্যা অনুল্লেখিত (সূরা আহযাব, ৩৩:৫০, ৫২)[‡]।

মহান আল্লাহতায়ালার কাছে, পুরুষের অবস্থান নারীদের কিছুটা উপরে (সুরা বাকারা, ২:২২৮), সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষ সমান দুজন নারী (সুরা বাকারা, ২:২৮২)। আমি সুরা বাকারা থেকে উদ্ধৃত করছি-

> 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না| আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া এবং ঋন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে| অত:পর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দূর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। **দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা** ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়... ।'

[‡] পবিত্র কুরানে চারটি বিয়ের উল্লেখ থাকলেও মহানবী (দঃ) নিজেই তাঁর জীবনে বিষয়টি লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে। খাদিজা মারা যাওয়ার সময় মহানবীর বয়স ছিল ৪৯। সেই ৪৯ থেকে ৬৩ বছর বয়সে মারা যাবার আগ পর্যন্ত তিনি কমপক্ষে হলেও ১১ টি বিয়ে করেন। এর মধ্যে আয়েশাকে বিয়ে করেন আয়েশার মাত্র ৬ বছর বয়সের সময়। এ ছাড়া তার দত্তক পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন; এ ছাড়া ক্রীত দাসী মারিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন যা হাফসা এবং আয়েশাকে রাগান্বিত করে তুলেছিলো; যুদ্ধবন্দি হিসেবে জুয়ারিয়া এবং সাফিয়ার সাথে সম্পর্ক পরবর্তীতে নানা রকম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। Ali Dashti তার 'Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad' বইয়ে মুহম্মদের জীবনে ২২ জন রমনীর উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তার ১৬ জন স্ত্রী, ২ জন দাসী, এবং অন্য ৪ জন বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কের উল্লেখ আছে।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, সাক্ষী সাবুদের ক্ষেত্রে দুজন পুরুষ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায় – তা হলে মহিলাদের দিয়ে কাজ চলতে পারে, তবে একজন পুরুষের বদলে দুজন নারীর সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে। শুধুমাত্র মহিলাদের সাক্ষী গ্রহনযোগ্য নয়। সাথে অন্ততঃ একজন পুরুষ থাকতেই হবে। যারা কোরানের মধ্যে সব সময় নারী-পুরুষের সাম্য খুঁজে পান, যারা বৈষম্যের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন, তারা এর কি জবাব দেবেন? নারীরা চিন্তায় চেতনায় পুরুষদের থেকে হীন, তাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তাদের বিচার বুদ্ধি কম, তারা ঠিকমত সাক্ষ্য দিতে পারবে না এই ভাবনা থেকেই মূলত – দুজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সমতুল্য করা হয়েছে।

নারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও। সুরা নিসা অনুযায়ী উত্তরাধিকার সুত্রে বাবা-মার কাছ থেকে একজন পুরুষ সন্তান যা পাবে, মেয়ে সন্তান পাবে তার অর্ধেক। আল্লাহ বলেন, (৪:১১),

> ‘আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: **একজন পুরুষের অংশ দু’জন নারীর অংশের সমান।** অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে| যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যেতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।’

মুসলিম ‘স্কলার’রা বলতে চান, মেয়ে বড় হয়ে যেহেতু স্বামীর সম্পত্তি পায়, তাই পিতার সম্পত্তি তাকে কম দেওয়া হয়েছে। এগুলো আসলে ছেলে ভুলানো ছড়া। আধুনিক বিশ্বে বহু নারী উপার্যনক্ষম। অনেকেই স্বামীদের থেকেও বেশী রোজগার করেন, তাদের অনেককেই স্বামীর উপার্যনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হয় না। মেয়েদের অনেকেই আজ বহুজাতিক কোম্পানির সিইও, এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতার-ও শীর্ষে ছিলেন, কিংবাএখনো আছেন। এদের কাছে ওই আয়াতগুলো বোকা বোকাই লাগবে। আর তা ছাড়া এমন অনেক নারীই আছেন যারা পরে বিয়েই করেননি, কিংবা করবেন না। মেয়েদের বড় হয়ে ‘স্বামী’ থাকতেই হবে – এটা কি ধ্রুব সত্য নাকি?

পবিত্র আল কোরানের দৃষ্টিতে বহুগামী পুরুষের কাছে নারী শুধুই সম্ভোগের বস্তু, সে জন্য দেখা যায় ইসলামী সৈনিকদের জন্য যুদ্ধবন্দি সধবা, বিধবা, বিবাহিত, অবিবাহিত সব নারীকে হালাল করা হয়েছে (৪: ২৪)। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের মহানবী থেকে শুরু করে হজরত আলী, হজরত ওসমান, হজরত ওমর সবাই যুদ্ধবন্দী নারী উপভোগ করেছেন, কখনোবা উপপত্নি বানিয়েছেন। কোরানে বলা আছে – ‘তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী (দাস, দাসী এবং যুদ্ধবন্দিনী)- আলাহ তোমাদের জন্যে

তাদেরকে বৈধ করেছেন" (৪:২৪)[§]! কোরানে মেয়েদের সংজ্ঞায়িতই করা হয়েছে শস্যক্ষেত্র হিসেবে - 'তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সন্তান উৎপাদনের) ফসলক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের এই ফসলক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো ...' (সূরা আল বাকারা, ২:২২৩)। এরপর কি আর কিছু বলার থাকতে পারে? যৌন কর্ষণের ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণের সকল ক্ষমতা পুরুষের হাতে দিয়ে দিলেন মহান আল্লাহতালা!

উপরের একটি সুরায়ও নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া তো দূরে থাক, মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হয়নি। এখন কথা হল, উপরে উল্লেখিত কোরানের নির্দেশ অনুসারে নারীরা পুরুষদের সমান ক্ষমতা দাবী করলে বিশাসীদের 'ধর্মীয় অনুভুতি' আঘাত পাবেই! কারণ তারা দাবি করতেই পারে, তাদের আচরণ কোরান অনুযায়ী সঠিক-ই আছে! আমরা দেখেছি এ সরকারের আমলে ঘোষিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ননীতি'র বিরুদ্ধে মোল্লাদের বিক্ষোভ। দেখেছি কিভাবে উত্তরাধিকার আইনে নারীদের পুরুষদের সাথে সমতা দিতে গিয়ে সরকার কিভাবে মোল্লাদের কাছে মাথা নত করে পিছু হটে গেলো।

ইসলামি আইনে 'জেনা' হলো, ব্যভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলন, ধর্ষণ ও পতিতাবৃত্তি। অর্থাৎ পরস্পরের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই এমন দুজন নর-নারীর মধ্যে যৌনমিলন হলো জেনা। ইসলামি শরিয়তী আইনে জেনার জন্য চরম শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, তবে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে শাস্তি দু'রকম। জেনার জন্য অবিবাহিত পুরুষের শাস্তি ১০০ ঘা বেত্র¨, বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে ৮০ ঘা বেত্র¨। কিন্তু নারীদের বেলায় প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড। আর এই 'জেনা' সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণ করতে চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন, কোনোভাবেই নারীর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামি আইনের এই ধরনের কঠোর-ভয়ঙ্কর বিধান থেকে বিশ্ববাসীর মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কতিপয় ইসলাম-দরদীরা আল কোরানের (সুরা নিসা, ৪:১৬) এই আয়াতটি উল্লেখ করেন- 'আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন (নর-নারী) এ (ব্যভিচারের) কাজ করবে, তাদের দুজনকেই তোমরা শাস্তি দিবে, (হাঁ) তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের (শাস্তি দেয়া) থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও...'। হঠাৎ করে এই আয়াত নজরে আসলে অনেকে ভাবতে পারেন, ব্যাভিচারে অভিযুক্ত দুজন নারী-পুরুষেরই শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, তাহলে অপরাধীদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সমান দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, এরকম দাবিও করেন অনেকে। কিন্তু আসলেই কী তাই, সত্যি কী এখানে দুজন অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হলে সমান শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে? এই আয়াতে কিন্তু কখনোই 'সমান শাস্তি' কথাটি বলা হয়নি, ভালো করে লক্ষ্য করুন। পূর্বের আয়াতটি (সুরা নিসা, ৪:১৫) আগে দেখি, তাহলেই বুঝা যাবে-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অপরাধীদের জন্য কী আল্লাহতায়ালার সমান দৃষ্টিভঙ্গি- 'তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারের) দুষ্কর্ম নিয়ে আসবে, তাদের (বিচারের) ওপর তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে চারজন সাক্ষী যোগাড় করবে, অতপর সে চারজন লোক যদি ইতিবাচক সাক্ষ্য প্রদান করে

[§] Dictonary of Islam থেকে জানা যায়, দাসী যদি বিবাহিতাও হয়, তাকেও অধিকারে নেয়ার ক্ষমতা আছে মনিবের। সুরা ৪:২৪; "তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন"- এই আয়াতের ব্যখ্যায় জালালান বলেন- "অর্থাৎ, যাদেরকে তারা যুদ্ধের ময়দানে আটক করেছে, তাদের সাথে সহবাস করা তাদের জন্যে বৈধ, যদি তাদের স্বামীগণ জীবিতও থাকে"

তাহলে সে নারীদের তোমরা ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে, যতোদিন না, মৃত্যু এসে তাদের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহতায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা না করেন।'

পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে আটক রাখার বিধান কোরানের কোথাও দেয়া নেই, কোরান থেকে কেউ দেখাতেও পারবে না। কিন্তু নারীকে নিয়ে এমন কঠোর বৈষম্যপূর্ণ বিধান থাকার পরেও আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা যখন দাবি করেন, আল কোরান বা আল্লাহতায়ালার কাছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান, তখন আর বলার কিছু থাকে না!

বাস্তব ক্ষেত্রে জেনা এবং হুদুদ আইন যে ধর্ষনকারীদের 'রক্ষা কবচ' হিসবে ব্যবহৃত হয় তা আমরা পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, সৌদি আরব সহ অন্যান্য ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে দেখেছি। ধর্ষন প্রমান করার জন্য 'চারজন সাক্ষী' প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মেয়েটির পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয় না, ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ধর্ষণকারীর ঘটে মুক্তি, আর মেয়েটা 'জেনা' করার দায়ে কপালে জুটে 'শারিয়ার রজম'। অনেক সময় দেখা যায়, মেয়েটির পরিবারই হতভাগ্য মেয়েটিকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয় পরিবারের 'সম্মান' রক্ষার জন্য। এর যে কত 'ডকুমেন্টেড কেস' আছে তার ইয়ত্তা নেই।

কোরানের দৃষ্টিতে পুরুষ চাইলেই তার স্ত্রীকে 'তালাক' দিতে পারে, শুধুমাত্র পরপর তিনবার অথবা আলাদা আলাদাভাবে শব্দটি উচ্চারণ করলেই হয়ে যায় (সূরা বাকারা, ২:২২৭-২২৯), কিন্তু এক্ষেত্রেও কোরান শরিফ নারীকে তালাক দেবার অধিকার দেয়নি[**] (যদিও ১৯৬১ সালের তৎকালীন আইয়ুব খান সরকার 'মুসলিম পারিবারিক আইন'-এ পবিত্র কোরানকে ডিঙিয়ে গিয়ে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে, এ জন্য সেসময় মোল্লা-মৌলভীরা অনেক চিল্লা-ফাল্লা করেছিল; যা হোক, বর্তমানে বাংলাদেশে এ আইনই কার্যকর রয়েছে)। আরেকটি আয়াত দেখুন- 'যদি সে (পুরুষ) তাকে তালাক দিয়েই দেয়, তাহলে তারপর (এ) স্ত্রী তার জন্যে (আর) বৈধ হবে না, (হ্যাঁ) যদি তাকে অপর কোনো স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়মমাফিক তাকে) তালাক দেয় এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তারা যদিই (সত্যিই) মনে করে, তারা (এখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে) আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে পুনরায় (বিয়ে বন্ধনে) ফিরে আসতে তাদের ওপর কোন দোষ নেই; এটা হচ্ছে আল্লাহর (বেঁধে দেয়া) সীমারেখা...।' (সুরা বাকারা, ২:২৩০)। এই আয়াত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো পুরুষ যদি তালাক দেয় (ইসলামিতাত্ত্বিকদের মতে, ভুলক্রমে হলেও) এবং পরে তার স্ত্রীকে ফেরত চায়, তবে সহজভাবে ফেরত নেয়া যাবে না। নারীটিকে আবার বিয়ে দিতে হবে অন্য পুরুষের সাথে, যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে, এরপর এই দ্বিতীয় স্বামী নামক পরিত্রাতার ইচ্ছা হলে তাকে তালাক দিবে, তারপরই নারীটি যথাবিহিত ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামীর কাছে

[**] আমার লেখাটি ইন্টারনেটে প্রকাশিত হবার পর এক ধর্মবাদী ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, কোরানে নাকি নারীর তালাক দেবার অধিকার আছে, কিন্তু সেটি 'উহ্য' রাখা হয়েছে। । উহ্য থাকলে কিভাবে সেটা কোরাণে থাকলো, তিনিই তা ভাল জানেন। তার কথা যদি সত্যি বলেও ধরে নেই, তা হলেও বলতে হয়, কোরানে পুরুষদের তালাক দেবার অধিকার উহ্য রাখা হয়নি, 'উহ্য' রাখা রাখি শুরু হয় কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রে! এ নিয়ে অনন্ত বিজয় খুব সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন 'আন্তর্জালিক আলাপন' নামে যা সাতরং ওয়েব সাইটে রাখা আছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, বিয়ে থাকলে তালাক আবশ্যক। আবশ্যক উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিবেচনায়। এক্ষেত্রে উহ্য রাখা কিংবা কোন রকম ছাড় থাকার যৌক্তিকতা নেই।

যেতে পারবে, নচেৎ নয়। এই আয়াতে তালাক দিবে পুরুষ, অথচ এর ফল ভোগ (ধর্ষিত হতে হবে) করবে নারী। ভুল করবে একজন, শাস্তি পাবে অন্যজন; একেই কী বলে সমানাধিকার! (কোন কোন তফসিরকাররা বা ইসলামি চিন্তাবিদরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বলে থাকেন, 'তালাককে নিরুৎসাহিত করার জন্যই এতো কঠিন বিধি করা হয়েছে।'- ওনাদের এ যুক্তি শুনলে বড়ই খেলো মনে হয়! যে পুরুষ ভুল করে তাকে কিছু দিতে হয় না, হারাতে হয় না, শাস্তি পেতে হয় না; অথচ নিরাপরাধ নারীটিকে সব মূল্য দিতে হয়; উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে ইক্যুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন!) ইসলামের পরিভাষায় এই দ্বিতীয় স্বামীকে বলা হয় 'মুহাল্লিল'। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলে গেছেন- 'মুহাল্লিলের সাথে বিয়ে তখনই বৈধ হবে, যখন তাদের দুজনের মধ্যে যৌন-মিলন হবে।'[††] (বোখারি হাদিস, ২০৭৮, ২০৭৯)

যাক, এসব সুরা এবং হাদিস নিয়ে মুসলিম ফেমিনিষ্ট এবং স্কলারদের বক্তব্য কী, এবার চোখ ফেরাই সেদিকে। আমেরিকান ফেমিনিষ্ট এবং মুসলিম স্কলার Amina Wadud Muhsin যিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং বর্তমান ইসলামিক স্কলারদের ইন্টারপ্রিটেশনগুলো অনুসন্ধান করে যে মতামত প্রকাশ করেছেন, সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত এর ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল'-বাক্যটি আসলে সেই সময়কার প্রেক্ষিতে রচিত। 'প্রেক্ষাপট এবং সময়' এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে। তখনকার আর্থ-সামাজিক বিষয়টিই এই সুরার মাধ্যমে প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু তখন পুরুষরাই ছিল পরিবারের প্রধান বা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমিনা মনে করেন বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই সূরাটির ব্যাপারে আরও উদার (লবিরোল) রিইন্টারপ্রিটেশনের সুযোগ আছে।

আরেক মুসলিম ফেমিনিস্ট মরোক্কান Fatema Mernissi এবং ইজিপশিয়ান আমেরিকান Leila Ahmed দুজনেই মোটামুটি তাদের বিভিন্ন লেখায় যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হল, ইসলামে যে সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে তা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যই প্রযোজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে পরস্পরবিরোধী। নারীর উপর ধর্মের নামে নানা বিধি নিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার ফলে নারীর অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হয়েছে। পুরূষের অধীনতা, বশ্যতা স্বীকার-ই তাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। Leila Ahmed আরও উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদের সময়ে, অর্থাৎ প্রথম যুগের মুসলমান সমাজ নারীর প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল ছিল। মূলতঃ আব্বাসীয় সময় থেকেই নারীর প্রতি চরম বৈষম্যমুলক ব্যবস্থা চালু হয় ধর্মের নামে। ইসলামের নামে না হলেও আব্বাসীয় যুগে-ই উপপত্নী গ্রহণকে আইনানুগ করা হয়। যা ছড়িয়ে পরে সর্বত্র। যার ফল হয় নারীর জন্য ভয়াবহ। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ফলে এদের মান-মর্যাদা বলতেও কিছু ছিল না; ছিল না কোন অধিকার। Leila Ahmed যে আইনকে উল্লেখ করেছেন, 'extreme androcentric bias' বলে। মুসলিম নৈতিকতার কণ্ঠটি কিন্তু এক্ষেত্রে ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। উপপত্নী এবং দাসীদের ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকার পাওয়ার ফলে নারীদের অবস্থা দাঁড়াল ঘরের কোনে পরে থাকা ব্যবহার্য্য কোন বস্তুর চেয়েও করুন। অধিকার বিহীন। অন্ধকারে দিন-রাত্রি পার করা শুধু। সমাজের উপর তলার নারী

[††] স্ত্রী তালাকের অবাধ সুযোগ বাস্তবায়নের জন্যই ইসলামের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে খন্ডকালীন বিয়ের প্রচলন আছে। যেমন মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ে চালু আছে 'মূত-আ' নামের অস্থায়ী বিয়ে। এতে বিয়ের এমনকি এক ঘন্টার মধ্যেই স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে, কিংবা চুক্তি মোতাবেক এমনিতেই তালাক হয়ে যায়। শিয়া সম্প্রদায় ছাড়াও, কুইন্সল্যান্ড, গ্রীনল্যান্ড, তাসমানিয়া, সামোয়া, উত্তর আমেরিকার নেটিভ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে স্বল্পকালীন মেয়াদভিত্তিক যৌন চাহিদা পূরণের 'ধর্মীয়' চুক্তির রেওয়াজ চালু আছে।

সমাজের অবস্থাও সুখকর ছিল না। কারণ এরা ছিল একেবারেই প্রান্তিক- যে কারণে আসলে তাদের কোনো 'ভয়েস'-ই ছিল না।

Mrnissiও প্রায় একই কথা উল্লেখ করেছেন, তিনিও দাবি করেছেন তুলনামুলকভাবে মোহাম্মদের সময় নারী কিছুটা হলেও স্বাধীনতা ভোগ করত। যেমন ঘরের বাইরে তাদের উপস্থিতির প্রমান পাওয়া যায়। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে না হলেও তিনি লিখেছেন - "They were active in the early Islamic movement." মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা ছিলেন প্রথম মুসলিম নারী। তাছাড়া মোহাম্মদের প্রিয় পত্নী আয়শা ছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের অন্যতম প্রধান উৎস।

Mernissi ভাষায় -"... She was a major political actor in the civil war or strife (fitna) following the assassination of the third caliph 'Uthman in 656. Her role as a source of hadiths is so important that in one tradition the Prophet is supposed to have told the Muslims that they ' received half their religion from a woman." এছাড়াও ইসলামে অনেক নারী বিদ্বেষী হাদিসের উৎস আবু হুরায়রার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেন। যেমন, Fatema Mernissi সহ অনেকেই মনে করেন আয়েশার সাথে সাহাবী আবু হুরায়রার দ্বন্ধের কারণেই বহু নারী বিদ্বেষী হাদিস সৃষ্টির মূল কারণ।

যাই হোক। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে 'পবিত্র ধর্মে'র নামে পিতৃতান্ত্রিকতার ভয়াবহ মিশেল দিয়ে উদ্ভট এক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে জেনেসিসের মিথ সামান্য অদল-বদল করে নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়েছে ইসলাম। তাই আদম হাওয়া আর গন্দম ফলের কথা পাওয়া যায় লোকমুখে। আদম এর প্রয়োজনে এখানেও দেখা যায় হাওয়ার জন্ম। অর্থাৎ ধর্মে নারী চরিত্রের সৃষ্টি পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য। বেহেস্তে যেতে হলেও নারীর জন্য প্রয়োজন হয় পুরুষের সার্টিফিকেট। প্রভু-স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট হলেই কেবল তিনি বেহেস্তে যাওয়ার সার্টিফিকেট পান, নাহলে নয়। যেমন হাদিস আছে, যে পর্যন্ত স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট নয় সে বেহেস্তে যেতে পারিবে না...।

এখানে আরেকটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। মুসলিম নারীবাদী এবং স্কলারদের দৃষ্টিতে সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে - কোরান অপরিবর্তনীয়-এই বদ্ধমূল বিশ্বাস। মুসলিমদের মধ্যে এই বিশ্বাসের ফলেই কোরানকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য সামান্য পরিবর্তন সাধন করাও এক কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে পুরুষতন্ত্র কোরানের আক্ষরিক অর্থ ধরে রাখায় অতি উৎসাহী। কিন্তু আমার মনে হয় এই সনাতনী মৌলবাদী চিন্তাধারার পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে কোরানের যে সব আয়াতে জেন্ডার ইস্যু পরিস্কারভাবে উল্লেখিত আছে, সেগুলো নিয়ে আসলে নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে। বর্তমান সভ্যতায় ইসমিক রাষ্ট্র আধুনিক রাষ্ট্র ধারণার সাথে খাপ খায় না মোটেই। বরং ন্যায় এবং সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মানে মধ্যযুগের আইনকে ধর্মের নামে আঁকড়ে পরে থাকা মানে সমাজ-সভ্যতাকে উটের যুগে ফিরিয়ে নেওয়া। আজকের সমাজ-বাস্তবতার সাথে যার দ্বন্দ্ব অনিবার্য। যেমন ইসলামিক ষ্টাডিজ এবং কম্পেরাটিভ রিলিজিয়ন-এর

অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ, এবং ইসলামসহ বহু গ্রন্থের লেখক Malise Ruthven লেখায় কিছুটা ফুটে উঠছে। আমি Ruthven -এর 'Islam' থেকে সম্পূর্ণ লাইনগুলো এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি :

> "The argument that a woman giving evidence on a business matter might need assistance from her friend might make sense under pre-modern conditions when most women were illiterate, but as the Quranic rules stand, the testimony of a woman with a higher degree in business administration is only worth half that of an illiterate male. Beyond such textual sticking points, however, there are areas where masculine or andocentric interpretations are being contested, particularly in the field of hadith, where the questioning of sources belongs to a time honoured methodology and is less controversial than taking issue with the text of the Quran. The biggest obstacles facing Muslim feminists are cultural and historical: feminism is perceived as coming from a hostile source." (Malise Ruthven: Islam, 113)

অবশেষে বলার কথা একটাই- যদিও মুসলিম নারীবাদীরা মনে করেন, 'ইসলাম' নয়, প্রতিক্রিয়াশীল পুরুষতন্ত্রই ধর্মের নামে নারী পুরুষের বৈষম্য টিকিয়ে রেখেছে। ঠিক একইভাবে খ্রিস্টান ধর্মেও দেখি খ্রিস্টান নারীবাদীরা যে উৎস থেকে গরলের উৎপত্তি, তাকে মাফ করে দেন আবলীলায়; খালি পুরুষতন্ত্রের উপর ঝাল ঝাড়েন। বিষয়টা কিছুটা হাস্যকরও। গোড়ায় গলদ রেখে মাথায় জল ঢেলে কি হবে? পুরুষ রচিত ধর্মে নারীর জন্য যৎসামান্য দয়া দাক্ষিণ্য আছে হয়ত, তাও তাদেরই স্বার্থে। নারীর স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে পূরুষের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর আখ্যা দিয়ে তাকে `ধর্মের` প্রলেপ মিশিয়ে মহিমান্বিত করা হয়েছে, এই বলে যে, নারী বাঁকা কারণ তার সৃষ্টিই বাঁকা হাঁড় থেকে। বিস্তারিত পরিসরে না গিয়েও হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, হিন্দুধর্মে ক্ষেত্রবিশেষে নারীর অবস্থা মুসলিম নারীর চেয়েও অনেক বেশি শোচনীয় ছিল। বিধবা বিবাহ ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। সতীদাহের মত জঘণ্য এক প্রথা চালু ছিল ধর্মের নামে। এই ধর্মে কয়েকজন যোগপুরুষের আবির্ভাবে আগের অবস্থার কিছুটা অবসান হলেও- এখনও নারী সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। নারী-শিশুদের তো এখনও সেখানে জন্মাতেই দেওয়া হচ্ছে না। সে আরেক ভয়াবহ চিত্র; অন্য প্রসঙ্গ।

মোদ্দা কথা হচ্ছে কোন ধর্মই যেহেতু নারীর প্রয়োজনে বা নারীর কল্যাণে সৃষ্টি হয়নি; নারীর ধর্ম-কাতরতা তাই দূর করা প্রয়োজন, তাদের নিজেদের-ই কল্যাণের জন্য। ধর্ম রচিত হয়েছে পুরুষদের দ্বারা, পুরুষদের জন্য, নারীর কল্যানের জন্য নয়। বেগম রোকেয়া এ প্রসঙ্গে 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন –

> 'যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ যাহা মানি নাই, তাহা পরে

ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগন ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

ধর্মে থাকবেন, আবার পুরুষের সমান অধিকারও দাবি করবেন, এটা আসলে অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি' যেমন, তেমনি। ধর্ম আকঁড়ে থাকতে গেলে এর চেয়ে বিপরীত চিত্র আশা করা যায় না। কারণ ধর্ম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়নি। মোল্লা, পুরোহিতরা কোত্থেকে দেবে? খোদ 'ধর্ম' বিষয়টাই উপড়ে ফেলতে পারলে, মানব সভ্যতা রক্ষা পেলেও পেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

- রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, ঢাকা
- মাহমুদ শামসুল হক, নারী কোষ, হাতে খড়ি, ২০০৫
- Drury, C. (1994) 'Christianity' in J. Holm with J. Boker (eds) Women in Religion, London, Printer Publishers, 30.
- Ruthven, M. (2000) Islam, 2nd edn, Oxford, Oxford University Press.
- Wadud-Muhsin, A. (1999) Qur'an and Woman: Re-reading the Sacred Text from a Women's Perspective, Oxford, Oxford University Press (first published 1992).
- Linda Woodhead, Christianity, Oxford University Press (2004)
- Ali Dashti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Mazda Pub; June 1994
- Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (1992)
- http://www.islamdharma.net
- http://www.banglakitab.com
- http://www.quraanshareef.org/

নন্দিনী হোসেন, সাতরং আন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা, এবং লেখক। বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক এবং সাপ্তাহিকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইমেইল - nondinihussain@gmail.com